সুখচর শশধর পাঠাগার ঃ (স্থাপিত – ১৯০৪ খৃঃ)

সন্তোষ কুমার বসাক

খড়দহ আর পানিহাটী। মাঝে সুখচর গ্রাম। গ্রাম আর শহরের অপূর্ব সংমিশ্রণ। গ্রামের সকল বৈশিষ্ট্যই আছে। আছে গাছপালা, পুকুর, পাখীর কলকাকলী। শহরের সুখ সুবিধারও অভাব এখানে নেই। আশেপাশে অনেকগুলি কারখানা গড়ে উঠেছে, কিন্তু গ্রামের ছন্দোময় জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। পূর্ব দিক দিয়ে চলে গিয়েছে বি.টি. রোড। বাস চলেছে ঘনঘন। কলকাতা এখান থেকে মাত্র ন' মাইল দূর। পশ্চিম দিকে গঙ্গার শান্ত জীবন। মাঝে মাঝে জোয়ার ভাঁটার অপূর্ব খেলা। পাড়ের কিছুটা অংশ চলে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। তীরের বট, অশ্বত্থ গাছ পড়েছে হেলে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরী যাওয়ার পথে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে পানিহাটী গ্রামে এসেছিলেন। তিনি যে ঘাটে নেমে ছিলেন, সে ঘাট এখনও ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান থেকে গ্রামের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছে রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের ষ্টেটের অধীন ছিল সুখচর গ্রাম। গঙ্গার ধার বেয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বাগান বাড়ী — 'রাজার বাগান'।

ধনজনে সমৃদ্ধ, প্রাচীন ঐতিহ্যপুষ্ট সুখচর গ্রামে পাঠাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল আজ থেকে ৬৪ বৎসর পূর্বে ইংরেজী ১৯০৪ সালে (বাংলা ১৩১১ সাল) তখন এর নাম ছিল— "লিটারারি এসোসিয়েশন"। কলকাতা বাংলাদেশেরসংস্কৃতিকেন্দ্র, শিক্ষার পীঠস্থান। এরই ঢেউ এসে লাগল সুখচরের কয়েকটি কিশোরবৃন্দের মনের উপর। একটা কিছু করতে হবে— ভাল কাজ, জনসেবা, শিক্ষার প্রসার— গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা। চেয়ে চিন্তে বই এনে তক্ষুনি ইচ্ছেটাকে কাজে পরিণত করা হলো। সংগ্রহ হলো রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি। কিন্তু উপন্যাস ওঅন্য ধরনের বইও পাঠাগারের জন্য প্রয়োজন। এবার চাই অর্থ, বই কেনা দরকার। গ্রামে বিত্তবান লোক থাকলেও তেমন সাড়া পাওয়া গেল না। উদ্যোক্তাগণ নিরুৎসাহ হলেন না। নিজেদের থেকেই হলো টাকা সংগ্রহ। কেনা হলো নুতন ও পুরাতন পুস্তক। তারপর চললো পাঠাগারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণপাত পরিশ্রম আর নিঃস্বার্থ সেবা। কিশোরদের পেছনে এসে প্রথম যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি হলেন গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বর্গত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি একটি টেবিল, একটি চেয়ার ও একটি আলমারি দান করলেন পাঠাগারের উদ্দেশ্যে। প্রথমে পাঠাগার শুরু হলো যুগল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানা ঘরে। নামকরণ হলো— "Youngmen's Literary Assocition", কার্যনির্বাহক সমিতিতে ছিলেন — সভাপতি ঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভ্য ঃ (১) বিষ্ণুপদ তরফদার, (২) কার্তিকচন্দ্র পাল, (৩) পরেশচন্দ্র সেন, (৪) মতিলাল ঘোষ, (৫) অভয়পদ হাজরা, (৬) নটবর দাস, (৭) যুগল চট্টোপাধ্যায়, (৮) বনমালি চরণ দে, (৯) সত্যহরি নন্দী ও আরো অনেকে।

পরের বৎসর ১৯০৫ সাল। বাংলার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে হঠাৎ পাঠাগার গৃহে আগমন হলো পুলিশের। পাওয়া গেল 'বোমা' তৈরীর ফরমূলার কাগজ পত্র। হাতে নাতে ধরা পড়লেন কয়েকজন ব্যক্তি। পরপর আরও দুবার পুলিশী জুলুম চলেছে পাঠাগার গৃহে। বইপত্র হয়েছে তছনছ। সরকারী চিহ্নিত নিষিদ্ধ পুস্তকগুলি রাখতে হয়েছে সরিয়ে। পুলিশী জুলুমের পর যে কয়খানা পুস্তক বেঁচে রইলো, তাই নিয়ে পাঠাগার পুনরায় কাজ চালাতে লাগলো কার্তিকচন্দ্র পাল মহাশয়ের বাড়ীতে।

'অনুশীলন সমিতি' যোগাযোগ করেছে পাঠাগার সভ্যদের সঙ্গে। পাঠাগারের মাধ্যমেই লাঠি খেলা, ছোরা খেলার পাঠ চলেছে দিনের পর দিন। কিছু দিন চলার পর পাঠাগার পুনরায় স্থানান্তরিত হলো কালীপদ শেঠ মহাশয়ের বৈঠকখানায় ও পরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দেউরির দোতলায়। দিনে দিনে পাঠাগার পুষ্টিলাভ করেছে। চাই বড় ঘর, জ্ঞানরাজ্যকে স্থান দেবার ঘর। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ। নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য সংগ্রহ হলো অর্থ। কালীতলায় নির্মিত হলো একতলা গৃহ। এই নির্মাণকার্যে দু'জন মহিলার দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিনোদিনী দে একখন্ড জমি দান করেছিলেন। যা বিক্রয় করে তখন ৬৫০ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। অপরজন বিধু বেওয়া, যিনি জীবনের শেষ সর্বস্ব ৪৫০ টাকা দান

করেন। এ ছাড়া রায়বাহাদুর ডাঃ গোপাল চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস নাগ এবং গ্রামবাসীদের সহৃদয দানে একখানি গৃহ তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। এই গৃহে সকালে ও দুপুরে বসতো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস। নাম— "সুখচর বঙ্গ বিদ্যালয়"। রাত্রে চলতো পাঠাগারের কাজকর্ম।

শশধর তরফদার মহাশয়, যিনি এই গ্রামের উন্নতিকল্পে অকাতরে পরিশ্রম করে অকালে কালের কবলে নিপাতিত হয়েছিলেন, তাঁরই নাম চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যগণের ও গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণের মত অনুসারে গ্রন্থাগারের নাম "সুখচর শশধর পাঠাগার" রাখা স্থির হয়। ফলে ২১ শে আগষ্ট ১৯২৭ সালে গ্রন্থাগারের নাম "ইয়ং মেন্‌স লিটারারি এ্যাসোসিয়েশন"— এর পরিবর্তে "সুখচর শশধর পাঠাগার" নামকরণ হলো।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের দিকে যুবকগণ তেমন নজর দিতে পারেননি। কারণ, পরাধীন ভারতকে শৃঙ্খলমুক্ত করবার প্রেরণায় তারা ছিলেন মগ্ন। ১৯০৪ সালে যে গ্রন্থাগার সামান্য কয়েকখানি বইয়ের পুঁজি নিয়ে আরম্ভ হয়েছিলো ক্রমান্বয়ে সেই গ্রন্থাগারের বই আরও বেড়েছে। এই সময় যাঁরা গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে, তাঁরা হলেন— প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনীরোধশ্যাম ঘোষ মহাশয়। একটিমাত্র ঘরে তাকে আর কুলোয় না। চললো দ্বিতল গৃহ নির্মাণের জন্য যুবকদের উৎসাহব্যঞ্জক শ্রম। পানিহাটি পৌরকর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান ও গ্রামের ভদ্রমহোদয়গণের সাহায্যে সংগৃহীত হলো প্রায় ৩,০০০ টাকা। ১৯৫২ সালের শেষার্দ্ধে নির্মিত হলো দ্বিতল কক্ষ। ছাঁদটি হলো টিনের। আসবাব-পত্রও তৈরী হলো। একতলার ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য।

১৯৫৩ সালের ৮ই জানুয়ারী গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠান হলো। গ্রন্থাগার দ্বিতলের নতুন ঘরে স্থায়ী বাসস্থান পেলো। এই বৎসরই বৈশাখ মাসে কালবৈশাখীর প্রচন্ড ঝড়ে টিনের চাল উড়িয়ে নিলো। সুসজ্জিত কক্ষ হলো বিনষ্ট। ইট সুরকীতে চাপা পড়লো বহু গ্রন্থ ও দ্রব্যসম্ভার। কিন্তু যুবকদের উৎসাহের কোনদিনই অভাব হয়নি। আজও হলো না। দ্বিগুণ উৎসাহে ৩০০ টাকা সংগ্রহ করে নতুন করে ভাঙ্গা ছাদ তৈরী করা হলো। যুবকদের গ্রন্থাগার-মনা এবং উৎসাহ সংগঠনে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, যিনি কর্মক্লান্ত দিনগুলিতেও পাঠাগারে এসে পাঠাগারের উন্নতি ও সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনের কথা চিন্তা করেছেন, কিন্তু খ্যাতির আশা করেননি, তিনি হলেন পাঠাগারদরদী শ্রীমানিকলাল মিত্র। তিনি ১৯৩৫ সাল থেকে পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং তাঁর অমূল্য সময়ের অংশ নিয়মিত দিনের পর দিন গ্রন্থাগারের নানা কাজে ব্যয় করে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীই তাঁর উপদেশ কৃতঞ্জচিত্তে স্মরণ করে ও পালন করে আসছে। এইভাবে সুখচর শশধর গ্রন্থাগার যুগ যুগ ধরে ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

শ্রমিক তুমি ধরো বই, ওটা হাতিয়ার